অপরজন

Aparjan – Bengali Webzine on Social, Cultural & Literary Issues

সম্পাদক – দেবাশিস দত্ত
প্রচ্ছদ – অমিতাভ প্রহরাজ

সূচী…

প্রচ্ছদ কাহিনী :: কবির নিজের প্রিয় কবিতা

- [প্রদীপ চক্রবর্তী-এর কবিতা (https://aparjan.com/2019/03/30/march2019-prchpo/)](https://aparjan.com/2019/03/30/march2019-prchpo/)
- [অনিন্দ্য রায়-এর কবিতা (https://aparjan.com/2019/03/30/march2019-anrapo/)](https://aparjan.com/2019/03/30/march2019-anrapo/)

____

- [গল্প : অর্ক চট্টোপাধ্যায় (https://aparjan.com/2019/03/30/march2019-archst/)](https://aparjan.com/2019/03/30/march2019-archst/)
- [গল্প : ঋজুরেখ (https://aparjan.com/2019/03/30/march2019-rist/)](https://aparjan.com/2019/03/30/march2019-rist/)

- [সুদীপ চট্টোপাধ্যায়-এর কবিতা (https://aparjan.com/2019/03/30/march2019-suchpo/)](https://aparjan.com/2019/03/30/march2019-suchpo/)
- [দীপক দাস-এর কবিতা (https://aparjan.com/2019/03/30/march2019-didapo/)](https://aparjan.com/2019/03/30/march2019-didapo/)
- [শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কবিতা (https://aparjan.com/2019/03/30/march2019-subapo/)](https://aparjan.com/2019/03/30/march2019-subapo/)
- [শৌভিক দে সরকার-এর কবিতা (https://aparjan.com/2019/03/30/march2019-sasapo/)](https://aparjan.com/2019/03/30/march2019-sasapo/)
- [অরিত্র সান্যাল-এর কবিতা (https://aparjan.com/2019/03/30/march2019-arsapo/)](https://aparjan.com/2019/03/30/march2019-arsapo/)
- [তাপস কুমার দাস-এর কবিতা (https://aparjan.com/2019/03/30/march2019-tadapo/)](https://aparjan.com/2019/03/30/march2019-tadapo/)
- [অমিতাভ মৈত্র-এর কবিতা (https://aparjan.com/2019/03/30/march2019-ammapo/)](https://aparjan.com/2019/03/30/march2019-ammapo/)

- [সংস্কৃতির প্রবাহে বাঙালির দুই শতক: বিশ্বায়নের সমাজতত্ত্ব – কৌশিক চট্টোপাধ্যায় (https://aparjan.com/2019/03/30/march2019-kaches/)](https://aparjan.com/2019/03/30/march2019-kaches/)
- [উত্তরাধুনিকতাবাদ সম্পর্কে কিছু কথা – আলোক মুখার্জী (https://aparjan.com/2019/03/30/march2019-almues/)](https://aparjan.com/2019/03/30/march2019-almues/)

- [অনুবাদ কবিতা : হিন্দোল গঙ্গোপাধ্যায় (https://aparjan.com/2019/03/30/march2019-higatr/)](https://aparjan.com/2019/03/30/march2019-higatr/)
- [অনুবাদ কবিতা : স্বপন রায় (https://aparjan.com/2019/03/30/march2019-swrotr/)](https://aparjan.com/2019/03/30/march2019-swrotr/)

- [কবিতা অতিক্রান্ত দূরত্ব ও দৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত – শুভ আঢ্য (https://aparjan.com/2019/03/30/february2019-suadcr/)](https://aparjan.com/2019/03/30/february2019-suadcr/)

অপরজন

Aparjan – Bengali Webzine on Social, Cultural & Literary Issues

গোড়ার কথা

একুশ শতকের বিশ্বায়ন বিশ্বকে উত্তর-দক্ষিণ গোলার্ধে দেখছে না, এটাকে এখন পূর্ব-পশ্চিমে ভাঙছে। এই বিভাজনের রাজনৈতিক-অর্থনীতি প্রসঙ্গে নানা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আমরা জানি। বলা হয় লগ্নি পুঁজির বাজার দখল এখন পশ্চিম থেকে পূবের দিকে ধায়। আরও জোরে, আরও বেশী পরিমাণে। বিশ্বায়নের সেই একুশ শতকীয় ধারা বাঙালির জীবনাচারে কেমন পরিবর্তন ঘটিয়েছে তা দেখা যেতে পারে। সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট বিশ শতকে কেমন ছিল তা ফিরে দেখার মধ্যে দিয়েই আজকের বাঙালির দিনলিপি আঁকা যেতে পারে।

সমাজতাত্ত্বিকগণ বিশ্বায়নকে কেবল তিন দশক আগে ঘটা একটা ঘটনা হিসেবে দেখেন না। তাঁরা মনে করেন না যে বিশ্বায়ন শুধুমাত্র একটি অর্থনৈতিক ঘটনা, যেখানে সারা দুনিয়া সুনির্দিষ্ট আর্থিক লেনদেনের নিয়মে বাঁধা থাকে। একুশ শতকের বিশ্বায়ন তার বাইরেও কিছু। বিশ্ব-বাণিজ্য, গ্যাট চুক্তি, আই এম এফ, বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক সাহায্য, ইত্যাদি ভারি ভারি শব্দে এবং ধারণায় বিশ্বায়নের তিন দশককে কিছুটা বুঝতে পারা যায়। সেখানে রাষ্ট্রের আর্থিক যোগে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ব্যাখ্যায় এই প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক-অর্থনীতির নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়। দেখা যায় সারা বিশ্বের প্রতিটা প্রান্তর এই প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে বিনিয়োগ ও পুঁজি আহরণের পথে নিজের দেশের অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করেছে। এই বক্তব্যে ভুল নেই। তবে তা সবটা নয়। বিশ্বায়ন তার বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যে রাজনৈতিক-অর্থনীতি প্রক্রিয়ার বাইরেও আজ প্রকটভাবে সচল থাকে।

বিশ্বায়ন শেকড় ছেঁড়া কোন প্রক্রিয়া নয়। তার একটা ইতিহাস আছে। ফলে এটা ঐ নব্বুইয়ের দশকে হঠাৎ করে শুরু হওয়া কিছু নয়। এর একটা অতীত আছে। সেই ইতিহাস কাল ধরে চলা বহুমাত্রিক সংযোগ এই সময় থেকে অবশ্য নতুন খাতে বয়তে শুরু করেছিল। বিশ্ব জুড়ে সকল সংযোগের মাত্রায় প্রযুক্তির ব্যবহার প্রবল হয়েছিল। সেটা ঠিক। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধ সেই ইতিহাস বর্ণনা করে না। এখানে বিশ্বায়নের রাজনৈতিক-অর্থনীতির বিষয় আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুও নয়। এখানে দেখতে চাওয়া হয়েছে সারা বিশ্বেই ছড়িয়ে রয়েছে যে বাঙালি, আর যে বাঙালি ঘর ছেড়ে জীবনেও কোনদিন কোথাও নড়েন নি সেই সব প্রকার বাঙালি জীবনে আজকের বিশ্বায়ন কেমন প্রভাব ফেলেছে? বিশ শতকেই বা তা কেমন ছিল? নতুন কি হয়েছে? এই দুই শতকে বাঙালি সংস্কৃতির প্রবাহ-অভিমুখ কোন দিকে?

এই সব প্রশ্নের সমাজতাত্ত্বিক উত্তর বাঙালির দৈনন্দিন জীবনধারার অভ্যন্তরে খোঁজার চেষ্টা করা যেতে পারে। সেটা এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। সেখানে বাঙালি সংস্কৃতির ওপর বিশ্বায়নের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উপাদানগুলির প্রভাব কেমন তা দেখা যেতে পারে। বাঙালি সংস্কৃতির পার্থিব বা বস্তুগত, এবং অপার্থিব বা মনোগত উপাদানগুলির ওপর প্রভাবশালী বিশ্ব-সংস্কৃতির ছাপ কেমন পড়েছে তা আলোচনায় উঠে আসতে পারে। বাঙালি সমাজের শ্রেণী ভেদ ও মর্যাদা স্তরীক্রমের কাঠামো পরিবর্তনের নিরিখে তা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। দেখা যেতে পারে বাঙালির অভ্যাস কোথায় কিভাবে বদলে যাচ্ছে। তবে বাঙালি যখন তার উৎসস্থল বিচারে সেই পূবের লোক, তখন উন্নত পশ্চিম সেই জীবন প্রণালীর সমরূপকরণে কতটা সফল হচ্ছে তার বিচার হয়ে যেতে পারে। সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির সমসত্ত্বতা, সমরূপতার দিকগুলি সেখানে আর একবার বিশ্লেষিত হতে পারে।

বাঙালিত্বের খোঁজে বিশ শতক

বাঙালির সংস্কৃতি চেতনায় জাতিসত্তা বোধ হল বাঙালিত্ব। এটা হল নিজের জাতিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বাঙালির সচেতনতা। উন্নাসিকতা। অবজ্ঞায় নাক উঁচু করে বা বাঁকা করে অপরজনকে, অথবা অন্য সম্প্রদায়কে, তুচ্ছ করার প্রবণতা সেখান থেকেই জন্মায়। *উন্নাসিক* আচরণ বা মনোভাবে সেই *উন্নাসিকতা ফুটে ওঠে।* জাতিসত্তা বোধ জাগরিত হয়। এটাও এক ধরণের ঐক্য। বাঙালি সংস্কৃতিতে ভাষা হল সেই ঐক্য বোধের ভিত্তি। বাঙালি যা, তাই হল তার সংস্কৃতি। তার দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার, বাসগৃহের ধরন, জীবিকার উপায়, পোশাকপরিচ্ছদ, মঙ্গলানুষ্ঠান, উপাচার, ক্রীড়া, নৃত্য, সঙ্গীত, সাহিত্য, নাট্যরীতি, সামাজিক সম্পর্কের প্রকৃতি, আত্মীয়তার ধারা, ধর্মীয় রীতি-নীতি,

শিক্ষা-দীক্ষা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ইত্যাদির মাধ্যমে সে যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করে, তা হল তার সংস্কৃতি। বাঙালি সংস্কৃতি।

বাঙালি সংস্কৃতি তার নিজস্ব ধরনের। সেই সংস্কৃতিকে মান্যতা দিয়েও বহুদিন ধরে বাঙালির বিশ্ববাস। হ্যাঁ, এই বিশ্বে বসবাসকারী, বাংলায় কথা বলা, মাছ-ভাতে সন্তুষ্ট, সুকুমার সূক্ষ্মতাবোধে সম্পৃক্ত, ফুটবল প্রিয়, বাক্যবাগীশ এবং তর্ক প্রিয় বাঙালির কথাই আমরা আলোচনা করতে চাইছি। আত্ম-সংযোগী, আন্ত:নির্ভরশীল, বহুমুখী প্রক্রিয়ার বিশ্বায়ন তাকে 'বাঙালী' থেকে 'বাঙালি' করেনি। তার জ্ঞান, আচার-আচরণ, বিশ্বাস, ধর্মাচার, রীতি-নীতি, নীতিবোধ, চিরাচরিত প্রথা, সমষ্টিগত মনোভাব, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং অর্জিত মতাদর্শের কীর্তিসমূহে সে বাঙালি হয়ে উঠেছে। প্রকাশিত হয়েছে তার বাঙালিত্ব। এবং সেখানে সে অনন্য।

বিশ শতকে এই বাঙালিত্ব দ্বিখণ্ডিত হয়। মূলত জ্ঞানে, বিশ্বাসে, আচারে, আচরণে এবং সর্বোপরি ধর্মাচারে তা দ্বিখণ্ডিত হয়। বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে বাঙালির ঐক্যবোধে সেই ভাঙন জোরালো ভাবে দেখা দেয়। এই বাংলার মুসলমানেরা বাঙালিত্ব নিয়ে তখন থেকেই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগতে শুরু করেন। হিন্দুর আচরণ, বিভাজনের বিরুদ্ধের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রকৃতি কোথাও তাদের তা ভাবতে বাধ্য করে। চেতনা স্তরে তার প্রতিফলন আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রতি বাংলার মুসলমান সমাজের সমষ্টিগত মনোভাবে দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ কেন মুসলমান নয়, অথবা 'তিনি তো হিন্দু' – সেই ভাবনা বাঙলি মুসলমান সমাজের মাথা ব্যথার কারণ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কেন মুসলমানের গুণকীর্তন করে গল্প-উপন্যাস-কবিতা লিখে ভরে ফেললেন না সেটাও ফলাও করে কোথাও প্রচার পেয়েছে। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের মতো কোনো মুসলমান কবির লিখতে না পারার ব্যর্থতাটাও আবার রবীন্দ্রনাথের অপরাধ বলে বিবেচিত হয়েছে। অশিক্ষার অন্ধকার সহজে সেই ভুল বোঝানোর সুযোগ করে দিয়েছে। বাঙালিত্বে ধরা চিড় পাকা হয়েছে।

শতকের শুরুতে এই নেতিবাচক পরিস্থিতির একটা ইতিবাচক পরিণতি আছে। তা হল দ্বিখণ্ডিত বাঙালিত্বে জোড় লাগার ঘটনা। বিশ্বায়নের ঔপনিবেশিক পর্যায়ের সেটা একটা রাজনৈতিক-সংস্কৃতির দিক। রাজনীতির সাংস্কৃতিক পরিসরে সেই সময় যেহেতু বিশ্বায়িত উপাদানের থেকে আঞ্চলিক সংস্কৃতির রাজনৈতিক উপাদানগুলি অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল তাই কাজটা সহজ হয়েছিল। খেয়াল করে দেখুন, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা না দিয়ে গান লিখেছিলেন। লোকায়ত বাউলের সুর ব্যবহার করে গড়ে তোলা সেই গানগুলিকে সাধারণ বাঙালি গলা মিলিয়ে গাইতে পারতেন। পথে নেমেই তারা তা গাইতেন, এবং হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের হাতে বেঁধে দিতেন ঐক্যের রাখি। এখানে কেউ কারও দৃশ্যবস্তু নন, সহযাত্রী।

সংস্কৃতির বাঙালি উপাদান সেই ফাটল বাড়তে দেয় নি। বিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে অবশ্য সেই বাঙালিত্ব চিড় ধরা অবস্থাতেই খানিকটা জোড়া তালি দিয়ে চলতে থাকে। সংস্কৃতির ধর্মীয় উপাদানে বিভক্ত বাঙালি কোথাও তখন বিশ্ব যোগেও বিপরীত অবস্থানে থাকে। ফ্রান্সের আকাশে জার্মানির যুদ্ধ বিমানকে মাটিতে নামাতে সফল ব্রিটিশ বায়ুসেনার একজন বাঙালি। তরুণ পাইলট ইন্দ্রলাল রায়। তিনি হলেন বিশ্ব-মানব বাঙালি। বাঙালি অঞ্চল-মানব তখন রাজনীতির পাঁকে পড়ে দিশেহারা অবস্থায়। শিক্ষায় বৈষম্য বাঙালিত্বে ফাটল বজায় রাখে। ফাটল বাড়ে না, বজায় থাকে।

এই পর্বে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা যে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ শুরু করে সেই ধারায় বাঙালিত্বের খোঁজ পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে। দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় অবিভক্ত বাংলায় বহুমুখী বাঙালিত্বের বর্ণময় উপস্থিতির খোঁজ পাওয়া যায়। ভাষায় আঞ্চলিকতা সেই বর্ণময়তার একটা কারণ হলেও তা প্রধান নয়। তবে একদিকে "হিংসা এবং রক্তপাত অন্যায় নয়, যদি তা মহৎ উদ্দেশ্যে করা হয়" – এই ধর্মীয় বিশ্বাস সংস্কৃতির সংঘাতকে অনিবার্য উপাদানে সম্পৃক্ত করতে থাকে। অন্য দিকে অধিকার বুঝে নেওয়ার চেতনায় নিরন্ন, শোষিত, নিপীড়িত বাঙালি কৃষকের সংগ্রামী রূপ ধর্মের ভেদ ভুলে লাল হয়ে ওঠে।

এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে এবং প্রজন্ম প্রবাহে সে বহমান। এই প্রবাহে সংস্কৃতির উপাদানগুলির মধ্যে দীর্ঘসূত্রিতার জন্ম হতে পারে। সেই সময়ে বাঙালি জীবনে বিষয়টা কেমন ছিল? বিশ শতকের প্রথমার্ধের মাঝামাঝি বাংলার আধুনিক শিল্পায়িত ও নগরায়িত সমাজেও সেই পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বিদ্যমান, কিন্তু নারী স্বাধীনতায় নগর সমাজে পরিবারের রূপটি পিতৃতান্ত্রিক রয়ে গেলেও পুরুষের একক প্রাধান্য পাওয়ার অনিবার্যতা সেখানে কিছুটা খর্ব। অর্থাৎ সংস্কৃতির বস্তুগত বা পার্থিব এবং মনোগত বা অপার্থিব উপাদানে পরিবর্তন ঘটেছে। রাঢ় বাংলার উদাহরণে বিষয়টাকে আর একবার ভাবা যেতে পারে। অন্যান্য দৃষ্টিকোণের বাইরে, রাঢ় বাংলার সংস্কৃতির পরিচয় পরব আর ব্রত পালনে তা ধরা যেতে পারে। করম, ভাঁজো পরব এখানের শস্য-উৎসব। ফসল রোয়া আর ফসল তোলার উৎসব। ধরমু-করমু ব্রতকথা। তোষলা, টুসু উৎসবের কথাও এখানে বলা যায়। এই সময় রাঢ় বাংলার শিল্পায়ন ও নগরায়ন সংস্কৃতির বস্তুগত বা পার্থিব উপাদানে (আবাস প্রকৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, ইত্যাদি) যতটা দ্রুত পরিবর্তন আনে, সংস্কৃতির মনোগত বা অপার্থিব উপাদানে (বিশ্বাস, রীতি, মূল্যবোধ, ইত্যাদি) সেটা ততটা দ্রুত ঘটে না। উপাদানের পরিবর্তন হারে এমন অসংলগ্নতার পরিসরই হল সাংস্কৃতিক দীর্ঘসূত্রিতার জন্মস্থান। বাংলার মাটিতে সেই সময় তা স্পষ্ট হয়েছে।

বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি সমাজের সেই সমাজতাত্ত্বিক বর্ণনা আমরা বিনয় ঘোষের অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যাতে পাই। তিনি সংস্কৃতিকরণের কথাও বলছেন। সেই প্রক্রিয়া একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি গঠনেই তৈরি হয় না, বিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে বিশ্বায়িত সংস্কৃতির উপাদানগত প্রভাব সেই সংস্কৃতিকরণের পথকেও প্রশস্ত করে। মানভূম থেকে বর্ধমান পর্যন্ত এসে করম পরব ও ধরমু-করমু ব্রতকথা হয়েছে ভাঁজো বা শস্পাতার ব্রত এবং ইঁদ পরব বা ইন্দ্রের উৎসব যা তার বজ্রচিহ্নাঙ্কিত আলপনায় শেষ হয়েছে। হুগলীর নগরাঞ্চলে সেই আলপনা রীতি ভুলেছে। পশ্চিমীকরণের কিম্বা আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া আদতে বাঙালিকে এই সময় নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যে বিশ্বায়িত সমরূপতার সাংস্কৃতিক প্রবাহে বইয়ে নিয়ে চলতে শুরু করে। জারি থাকে প্রান্তীয়করণ প্রক্রিয়া।

বিশ শতকের প্রথমার্ধের শেষ দিকে চোখ রাখলে তা আরও স্পষ্টভাবে দেখা যায়। সাংস্কৃতিক দীর্ঘসূত্রিতার পরিসর সংস্কৃতিকরণের পথে বাঙালির ঘরে তখন মতাদর্শকে আপন করে তুলেছে। ভেতো বাঙালির সঙ্গে বোমা ছুঁড়তে ওস্তাদ বাঙালির দ্বৈত পরিচিতি সত্তার কোথাও তো বারুদ আগেই ছিল। সেই আগুন তিরিশের দশকের আধিয়ার আন্দোলনে ভূমিহীন এবং স্বল্প-জমির চাষিদের সংগ্রামী চরিত্রে ফুটে ওঠে। বাবু কালচারের শহুরে অথবা গ্রামের উচ্চবিত্ত হিসেবে জমিদারের জীবনাচারের সঙ্গে খেটে খাওয়া, দিন-আনা-দিন-খাওয়া শ্রমিক, কৃষক, জেলেদের জীবনধারা মেলে না। হুজুগে বাঙালি তার বর্ণগোষ্ঠী (বা এথনিক গোষ্ঠী) পরিচয়ে তখন বাঙালিত্ব খুঁজে পায় না। খুঁজে

পায় যেটা সেটা *বিজ্ঞান* পঠনপাঠন *ও বিজ্ঞান* গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনে কৃতী *বাঙালির* বিজ্ঞানচর্চায় এক ধরণের মগ্নতা। শিক্ষা ও সংস্কৃতির সেই অলিন্দের পুরোধা হন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রমুখ।

ভেতো বাঙালির নিরন্ন অবস্থা এক সংস্কৃতিকে ভাঙে, আর এক সংস্কৃতিকে গড়ে। পঞ্চাশের (১৯৪৩) মন্বন্তরে যে বাঙালির (সরকারি হিসেবে ৩০ লাখ এবং বেসরকারি হিসেবে ৫০ লাখ) মৃত্যু হয় তাতে সপরিবারে মৃত্যুবরণ ঘটেছে এমন ঘটনার উপান্তে কৃষক ও ধীবরদের আধিক্য থাকে। কৃষির সংকট সমাজের যে আর্থিক বিপর্যয়ের কথা বলে তার প্রভাব বাংলার সংস্কৃতির উপরেও পড়ে। শোষণ মুক্ত স্বাধীন সমাজের স্বপ্ন, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধে কবি-সাহিত্যিক কলম ধরেন। সুকান্ত ভট্টাচার্য সেই ধারার উজ্জ্বল নক্ষত্র।

এটা হল সাংস্কৃতিক উপাদানের ওপর অর্থনৈতিক চলকের প্রভাব। এই প্রভাবকে এক কথায় বুঝিয়েছেন কবি দিনেশ দাস। 'কাস্তে' কবিতার সেই দুই অসাধারণ পংক্তি তখন মানুষের মুখে মুখে ফেরে : 'চাঁদের শতক আজ নহে তো/ এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে।' ১৯৩৮ সালে শারদীয় আনন্দবাজারে দিনেশ দাসের এই 'কাস্তে' কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। কবিবন্ধু অরুণ মিত্রের সৌজন্যে তা প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এর প্রভাব বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, কথা সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সহ অনেকের সঙ্গে জনমানসে হিন্দোল তুলেছিল। খেটে খাওয়া মানুষের কথা বাঙালি সংস্কৃতির অংশ হল। বাঙালির অনন্য পরিচয়।

এই ধারায় 'টঙ্ক আন্দোলন'-এর কথাই না হয় ধরুন। টঙ্ক মানে ধান কড়ারী খাজনা। ধান হোক বা না হোক কড়ায় গণ্ডায় জমিদারকে তার পাওনা খাজনা বুঝিয়ে দিতে হবে। মাঠে ফসল ফলা বা না ফলার ওপর টঙ্ক ব্যবস্থা নির্ভরশীল নয়। এই শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে উঠে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকার গারো পাহাড়ের পাদদেশে সুসং-দুর্গাপুর এলাকায় তিনের দশকের মাঝামাঝি থেকে সংগঠিত হয়েছিল এই গণআন্দোলন। দীর্ঘ ১২ বছর ধরে এই টঙ্ক আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নারী-পুরুষ-শিশুসহ ৬০ জন মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি মেয়েরা অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে আরও সামনে এসেছেন। অন্তঃপুরবাসিনী নারী চরিত্রের শ্রেণী চরিত্র খুঁজে পাওয়ার মধ্যে নিশ্চিতভাবেই এক ধরণের নতুন সংস্কৃতির বীজ লুকিয়ে থাকে। মণি সিংহ, রাসমণি, কুমুদিনী হাজং জীবনের বিনিময়ে সেই ভূমিকায় স্মরণীয় হন।

সেই ঘটনার পর তেভাগা আন্দোলন শুরু হয় বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর ডাইরেক্ট এ্যাকশন নামক (১৬ আগস্ট ১৯৪৬) ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হবার তেরো মাস পর। সেই সোহরাওয়ার্দীয় সরকারি দাঙ্গায় কলকাতাতেই বারো হাজারের বেশী (বেসরকারি হিসেবে) শহরবাসী নিহত হন। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালিতে দাঙ্গা চরমরূপ নেয়। এই "গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং" (১৯৪৬) সম্পর্কে লিওনার্ড মোসলে তার বই "দ্য লাস্ট ডেজ অব ব্রিটিশ রাজ"-এ লিখেছেন, "ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাওড়ার দিক থেকে লাঠি, লোহার রড, ছুরি, সড়কি, স্বয়ংক্রিয় ক্র্যাংক্, ইত্যাদি নিয়ে দলে দলে লোক আসতে শুরু করলো কোলকাতায়। এরা অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত অবাঙালি মুসলমান গুণ্ডা। তারা মিশে গেলো চৌরঙ্গী, চিৎপুরে অপেক্ষমাণ বাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে, দুপুর দুটোর পর শুরু হলো হিংসাশ্রয়ী আক্রমণ।... রাস্তায় চলা গরুরাও সেই বীভৎস নারকীয় আক্রমণের হাত থেকে বাদ যায় নি।... হিন্দুর প্রতীক হয়েছে গরু... আহতদের আর্তনাদ, লাঞ্ছিত নারীর ভয়ার্ত ক্রন্দন, চাপা পড়ে যায় তখন ধ্বংসের উন্মত্ত কোলাহলে... আগুনে

জ্বলতে থাকে হিন্দুদের স্থাবর, অস্থাবর সবকিছুতে... *বাংলার* আকাশে উড়ে কুণ্ডলায়িত কালো ধোঁয়া" (*ইটালিক্স* আমার। পাতা, ২৯-৩১)।

শান্তিপ্রিয় বাঙালি সমাজ সেই অন্ধকারে বাঙালিত্বকে খোঁজে। এই রীতিহীনতা বাঙালি জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতির অভ্যন্তরে মতাদর্শের স্থান পাকা করে। দেশপ্রেম আর জাতীয়তাবাদ যে এক নয় বাঙালি তা টের পেয়ে গেছে তখন। কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে কী হিন্দু কী মুসলমান চাষি তারা মুসলিম লীগ আর কংগ্রেসের মৌখিক প্রতিশ্রুতির অসারতা ততদিনে বুঝে গিয়েছিল। ফলে তেভাগা আন্দোলনকে গান্ধীজী মনেপ্রাণে সমর্থন না করলেও সেদিন কৃষক আন্দোলনে বাঙালির ইতিহাস রচিত হয়েছিল কমিউনিস্টদের হাত ধরে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার আহ্বানে সেই আন্দোলন শুরু হবার পর বুদ্ধিজীবী বাঙালি অবিভক্ত বাংলাকে দ্বিতীয় তেলেঙ্গানা নামে অভিহিত করেন। আধিয়ার বিদ্রোহের পর ১৯৪৬-১৯৪৮ সাল ব্যাপ্ত এই লড়াকু আন্দোলন মতাদর্শের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই তৈরি হয়েছিল। সেও এক সংস্কৃতি যা আর্থিক বুনিয়াদের বদল চায়। বাংলার কৃষকের সেদিন দাবি ছিল তেভাগা চাই। তিন ভাগ ফসলের দুই ভাগ কৃষকের থাকা চাই। এক ভাগ জমির মালিক, জোতদার-জমিদার পাক।

এ আন্দোলন বাংলার ১৯টি জেলায় কেবল ছড়িয়ে পড়েনি, বাংলার সংস্কৃতিকে একটা অন্য ধারায় প্রবাহিত করেছিল। সংস্কৃতির সেটা হল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নির্মাণ। রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি জেলা, ২৪ পরগণার আবাদী এলাকার কৃষকদের পাশাপাশি ক্ষেতমজুররাও এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। বাংলায় প্রায় ৬০ লক্ষ কৃষক-ক্ষেতমজুর সেই লড়াইয়ে যুক্ত হয়ে সেটাকে গণসংগ্রামের রূপ দেয়। বাংলার কৃষক ও কৃষকরমণী এই গণআন্দোলন গড়ে তোলায় এর একটা সাংস্কৃতিক যোগ লক্ষণীয় হয়।

গণসংগীতের প্রচলন হয়। সহজিয়া, বাউল, কর্তাভজা ও সুফি সম্প্রদায়ের গানের পাশে মানুষের লড়াইয়ের কথা শোনায় গণসংগীত। সেই দল আমরা-বোধে সম্প্রদায় হয়ে ওঠে। সংগীতকার সলিল চৌধুরীর সঙ্গে রঘু চক্রবর্তী, অনিল ঘোষ ও নিত্যানন্দ চৌধুরীর কথা এখানে বলতে হয়। 'দেশ ভেসেছে বানের জলে ধান গিয়েছে মরে', অথবা 'কৃষকসেনাদের মুষ্টি তোলো আকাশে'- এই গান আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিনয় রায়ের তেভাগা আন্দোলনের গান 'আর কতকাল বল কতকাল' ভোলার নয়। শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্তের মতো শক্তিশালী অভিনেতা, নবান্ন নাটকের মঞ্চায়ন, বাংলা থিয়েটার ধারাকেও এক সুনির্দিষ্ট অভিমুখে সচল করে।

নাটক স্কোয়াডের গঠন, আইপিটি-এর গঠনের কাজ সংস্কৃতির সকল বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানগুলিকে নতুন আঙ্গিকে গড়ে তুলতে চায়। সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারাণের নাতজামাই'। ১৯৪৮-এ বড়া কমলাপুরে কৃষক-পুলিশ সংঘর্ষের পটভূমিতে লেখা তাঁর আর এক গল্প 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' *বাংলা সাহিত্যে* সুপরিচিত। প্রণব চৌধুরী, কার্তিক পাইক থেকে সত্যজিত রায়, মৃণাল সেন, সকলেই সেই ঘরানাকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাঙালির এই জীবনধারা নিয়ে উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র হল হারাণের নাতজামাই, ছিন্নমূল, দো বিঘা জমিন, রিকসাওয়াল, ছোটবকুলপুরের যাত্রী, অশনি সংকেত, ইত্যাদি। দেবেশ রায়ের তিস্তাপারের বৃত্তান্ত বইটিতে যে কৃষকনেতা লাল শুকরার কথা বলা আছে সেই লাল শুকরা তেভাগার গানে মানুষকে জাগিয়েছিলেন। মানুষের দাবি হলে যে গানেই

চেতনা জাগানো যায় তা তিনি বাংলার মাটিতে ফলিয়ে ছিলেন। সে ছিল গণনাট্য সঙ্ঘের উচ্চাসন। নতুন দিনের ভোরে বাঙালির নতুন পরিচয়।

এই পর্বের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমীকরণে তখন বাঙালিত্বও বহুবিভক্ত হয়েছে। কারণ ১৯৪৭ সালে দেশভাগের মধ্য দিয়ে বাঙালি স্বাধীন হয়েছে। এপারের কেন্দ্রে ও রাজ্যে যাদের হাতে শাসনভার এসেছে, তারা হলো দেশী-বিদেশী পুঁজিপতি ও গ্রামীণ জমিদার–জোতদারদের তল্পিবাহক। ফলে তাদের তোষণনীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে তখন দেশে খাদ্য সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। আর ওপার বাংলায় বাঙালিকে বাধ্য করা হয় বাংলা ভাষাকে ছাড়তে। ধর্মীয় হিংসায় হিন্দু অংশ পশ্চিমমুখী হয়। সে হল বাঙালির সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তিবাদ। সে কথায় পরে আসছি।

প্রসঙ্গত, এই সংকট দুই বাংলার বাঙালিকে বাঙালিত্ব প্রকাশে সাহায্য করে। ভাষার প্রতি অটুট ভালোবাসা আর সচেতন যূথবদ্ধতায় বাঙালি কোথাও এক হয়ে যায়। মানভূমে বাংলা ভাষার জন্য লড়াইয়ের কথা আমাদের অজানা নয়। লোকগানের ধারাতেও তা প্রতিফলিত। ‘তবুও থামে নি লড়াই। শুন বিহারি ভাই/ তরা রাইখতে লারবি ডাঙ দ্যাখাই। এক ভারতের ভাইয়ে ভাইয়ে মাতৃভাষায় রাজ্য চাই।’- এই ছিল সে সময়কার টুসুগান। ১৯৫২র ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার জন্য পুবের বাঙালিদের, আর ১৯৬১র ১৯ মে উত্তরপূর্বের বারাক উপত্যকায় ভাষা আন্দোলন সেই সব আত্মত্যাগকে স্মরণ করে সংস্কৃতি চেতনায়।

একুশের বৈপ্লবিক চেতনা পুবের বাঙালিদের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এই ভাষা চেতনার স্পর্শে আলোকিত ও বিকশিত হয়েছে ও হচ্ছে সমগ্র বাঙালির সাহিত্যালোক, সংস্কৃতি ও শিল্পাঙ্গন। বাঙালি রক্তে রাঙানো সেই একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের শহীদ দিবস। স্বাধীনতার লড়াইয়ের সময় থেকেই বাঙালি সংস্কৃতিতে যে আত্মত্যাগের উপাদান জোরালোভাবে সচল ছিল তা এই সকল ধারায় ক্রমে ঐতিহ্যে পরিণত হয়। মানভূম, পশ্চিম পাকিস্তান, বারাক অঞ্চলে বাংলা ভাষার লড়াই যে বাঙালিত্বকে স্পষ্ট করে সেই স্বাদের ভাগ হয় না। যদি ভাষার অধিকার হরণ করা হয় তাহলেই গর্জে ওঠে বাঙালি। তালিকায় রফিক উদ্দীন আহমদ, আবদুল জব্বার, শফিউল রহমান, আবদুস *সালাম,* আবুল *বরকত,* আবদুল আউয়াল, মোহম্মদ অহিউল্লাহর সঙ্গে উচ্চারিত হয় কমলা ভট্টাচার্য, কানাইলাল নিয়োগী, বীরেন্দ্র সূত্রধর, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, কুমুদরঞ্জন দাস, হিতেশ বিশ্বাস, সত্যেন্দ্র দেব, সুনীল সরকার, তরণী দেবনাথ, শচীন্দ্র চন্দ্র পাল, সুকমল পুরকায়স্থ প্রমুখ ভাষা শহীদের নাম। ভাষার টানে তাঁরা প্রাণ দিয়েছেন।

একুশের ভাষা আন্দোলনের মুল চরিত্রই ছিল সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার। যে সংস্কৃতিকে আমরা বাঙালি সংস্কৃতি বলে গণ্য করতে চাইব, তার প্রতিশ্রুতি ছিল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে। তাকে হতে হবে ঐক্যবদ্ধ ও গণতান্ত্রিক, অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িক ও ইহজাগতিক, যার মধ্যে থাকবে বাঙালির সংগ্রামীলতার প্রকাশ। সেই সঙ্গে সে হবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। আবুল হোসেন, আব্দুল গনি হাজারী, তালিম হোসেন, ফারুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান ও অন্যান্যদের পাশাপাশি হাজির হন নির্মলেন্দু গুণ। ফলে, সংস্কৃতি আন্দোলনের প্রভাব ব্যাপক মাত্রায় পড়ে রাজনৈতিক পরিসরে। সাংবাদিকতায় সাহিত্যিক যুক্ত হন। সুনীল গাঙ্গুলী থেকে আবুল কালাম শামসুদ্দিনের নাম সেই ধারায় উজ্জ্বল থাকে। মানুষের সামাজিক অবস্থান তাঁর চেতনাকে নির্ধারণ করে। আর সেই চেতনায় ঋদ্ধ হয় আপামর বাঙালি।

বাঙালির এই একীভবন বৈপ্লবিক চেতনাতেই গড়ে ওঠে। কারণ পশ্চিমের বাঙালিও তখন খাদ্যের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন এবং লাগাতার গণআন্দোলন ও গণবিক্ষোভ প্রদর্শনের রাস্তা গ্রহণ করেন। জনসাধারণের দাবিগুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিচার-বিবেচনা করার পরিবর্তে পশ্চিমবঙ্গের তখনকার কংগ্রেস সরকার বিক্ষোভকারীদের উপর নির্মম দমন-পীড়নের রাস্তা গ্রহণ করে। ফলে এখানেও রাজপথের দখল নেয় গ্রামবাংলা থেকে আসা হাজার হাজার মানুষ। ১৯৫৯ সালের ৩১ আগস্ট খাদ্যের দাবিতে কলকাতার সেই শেষ বিকেলের আবছা আলোয় কমিউনিস্টদের যৌথ মঞ্চ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির সেই মিছিলকে তিনদিক দিয়ে ঘিরে ধরে পুলিশ। পিটিয়ে, স্রেফ লাঠি দিয়ে পিটিয়ে সরকারি হিসাবে ৮০ জন আর বেসরকারি মতে শতাধিক মানুষকে খুন করা হয়। একত্রিশে অগস্ট খাদ্য আন্দোলনের শহীদ দিবস। ট্র্যাডিশন সমানে চলে।

সাংস্কৃতিক স্থিতির একটা বড় দিক হল এই ট্র্যাডিশন বা ঐতিহ্য। সাধারণত সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সততার প্রতীকসমূহের প্রবাহকে আশ্রয় করেই ঐতিহ্যের প্রত্যয় গড়ে উঠেছে। সংস্কৃতির কালিক প্রবাহ হল এই ঐতিহ্য। দেশভাগের ফলে বাঙালি সংস্কৃতির বিক্ষেপণ দ্রুততার সঙ্গে ঘটে। এটি সংস্কৃতির ভৌগোলিক প্রবাহ, যাকে নৃতাত্ত্বিকগণ ও সমাজতাত্ত্বিকগণ 'ডিফিউসন' বলছেন। সংস্কৃতির এই পরিব্যাপ্ত প্রবাহ ভৌগোলিক বলে এটা অনুভূমিক, যখন সংস্কৃতিতে ঐতিহ্যের কালিক গতি হল উল্লম্বিক। সাংস্কৃতিক উপাদানের অনুকরণ ও ধারকের ভৌগোলিক গমন সার্বিকভাবে বাঙালি সংস্কৃতির প্রসারে প্রযুক্তির সংযোগকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীনভাবে মেনে নেয়।

নিয়ম ভাঙাটাই তাঁর নিয়ম। বাঙালি সংস্কৃতিতে শহীদ উপাদানের ঐতিহ্য সেই নিয়ম ভাঙার ধারাটাকেই খাড়া করে। সত্তরের দশকে একদিকে বাঙালির স্বাধীনতা, ভাষার প্রতিষ্ঠা, মুক্তি যুদ্ধ, দেশপ্রেম, আর অন্যদিকে খাদ্য আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন, উদ্বাস্তু জীবনের স্থিতিতেও অসহনীয় অসহায়তা, ক্ষিদের জ্বালা, এবং এক সামাজিক অবক্ষয়ে কালিক বাঙালির সংস্কৃতিকে প্রকাশ করে। তাঁর সিনেমায় তিনি আগে থেকেই তা ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তিনি মৃণাল সেন। 'ভুবন সোম', 'খারিজ', 'কলকাতা ৭১', 'পদাতিক', 'আকালের সন্ধানে', 'ইন্টারভিউ'র মধ্য দিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন বাংলা সিনেমার মৃণাল যুগ। তিনি আত্মঘাতী বাঙালি নন। যদিও নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মতো বিশ্ব-মানব বাঙালি, বাঙালীকে আত্মঘাতী সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে চিনছেন।

বিশ শতকে বাঙালি সংস্কৃতি প্রবলভাবে বিশ্বায়িত হয়েছে। এই শতাব্দীর সাংস্কৃতিক প্রবাহে বাঙালিত্ব তার চেতনার বিস্তারে ও বুদ্ধির জাগ্রত প্রাগ্রসরতায় উজ্জ্বল হয়েছে। জীবনবোধের সততায় বাঙালি এমন একটি স্বচ্ছ সরল বাঙালিত্বের সন্ধান দেয় যা হল বাংলার আড়ম্বরহীন চলিত ভাষার অলংকৃত ছন্দে হৃদয় নন্দ। এই শতকে যে বাঙালি সারা বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়েছে, আর যে বাঙালি জীবনেও ঘর ছেড়ে কোনদিন কোথাও নড়েন নি তিনিও আকর্ষণের কারণ হয়েছেন। ভৌগোলিক চলাচলের বাইরে দাঁড়িয়ে বাঙালি সংস্কৃতির 'ডিফিউসন' ঘটছে। সাংস্কৃতিক উপযোজনে, আত্তীকরণে বাঙালির জীবনধারায় নতুনের চল হচ্ছে।

বাঙালির আঞ্চলিক উপাদানে ভরা সংস্কৃতি বাঙালি বিশ্ব-মানবের হাত ধরে কিংবা না ধরে বিশ্বের দরবারে পৌঁছেছে। ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, কবিগান, জারিগান, ছৌ নাচ ইত্যাদি তাদের আঞ্চলিক জনপ্রিয়তায় ম্রিয়মাণ হলেও তার বিশ্বায়ন ঘটেছে। এই শতকের সমাজ-সাহিত্য ঈশ্বরমুখী নয়, বরং তা মানবমুখী। সাহিত্যের বিষয়বস্তু এবং মূল ভাবধারাই এই সময়ে বদলে যায়। এই শতকের শেষ দিকে বাঙালির অনাড়ম্বর মিলন ক্ষেত্র হিসাবে উৎসবমুখরতার

ঐতিহ্য বাঙালিত্বের অনুসন্ধান নতুন আঙ্গিকে করে যেখানে লোকসাহিত্যের প্রভাব বেশ দুর্বল বোধ হয়। হারিয়ে যায় বিশ্বাসের চারা মূল।

একুশ শতকের বাঙালিয়ানা

এক বিংশ শতাব্দী হল বাঙালির একুশ শতক। এই শতকের বাঙালি জানে যে তার ভাবায় কিছু হয় না। ফলে ভুবনের ভার নেওয়ার অভ্যাসকে সে জীর্ণ বস্ত্রের মতো ত্যাগ করতে শিখে গেছে। সে নিজের মতো ভাবতে শিখেছে। সে নিজেকে রপ্ত করেছে তার জীবনমুখী সংস্কৃতির ধারায়। যেখানে সে নিজের মতো থাকতে চায়, গুছিয়ে নিতে চায় নিজেরটা। গত তিরিশ বছর ধরে সে তার এই মধ্যবিত্ত মননকে এমন ভাবেই আশকারা দিয়ে আসছিল। তাই সে সহজেই গুলে গেল আজকের প্রযুক্তিনির্ভর ক্রেতাসর্বস্ব বিশ্বায়নে।

এই খাপ খেয়ে যাওয়ার পিছনে মূল যে বৈশিষ্ট্যটা তাকে সাহায্য করেছিল তা হল তার ভাঙার অভ্যাস। প্রচলিতকে ভাঙো, তাকে আবার নতুন করে গড়ে তোল। এটা যে কোন সভ্যতার টিকে থাকার নিয়ম। সময়ের সঙ্গে বদলাও। বাঙালিয়ানাতেও সেটার ব্যতিক্রম হয় নি। কিন্তু বাঙালির এই গুণটা যেহেতু প্রকট বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে তাই সে সহজেই নিজেকে ভেঙে ফেলেছে। এখানেই সে আত্মঘাতী। তাই সে অনাড়ম্বর মিলন ক্ষেত্র হিসাবে উৎসবমুখরতার ঐতিহ্য ভুলেছে। আর উৎসবের ঐতিহ্যকে বাঙালি করে তুলেছে 'স্পেকট্যাকল'। সেটা করতে পেরেছে বলেই তার নিজের কবিতা তার নিজের কাছেই মধ্যরাতের আর্তনাদ মনে হয়। স্পর্শকাতর বাঙালি মনের বিশ্বায়ন ঘটেছে নতুন শতকের ভোরে।

প্রেমের প্রশস্ত বসন্তের চরাচরে বাঙালি তরুণ আজ হাঁটতে রাজী নয়। অতো সময় তার নেই। গার্লফ্রেন্ড বদলে যাওয়াটা তার কাছে এখন গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ঠিক করে দেয়। চ্যুতি সেই গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। পার্টনার অনুযায়ী পাল্টে যায় তার হেয়ার স্টাইল, চুলের ক্রিম, ডিওডোরান্টের গন্ধ, জামাকাপড়, মোবাইলের কলার টিউন। ভোক্তার পরিচয়ে তার বহু তল, বহু অভিনব মাত্রা। দেহ রাজনীতির এও এক বিশ্বায়নী ফাঁদ। এই সমসত্ত্বতায় যেকোনো সময় সেও পাল্টে নিতে পারে তার মুখের ভাষা। কাকে বলছে? কেন বলছে? কি যুক্তিতে বলছে? যে যুক্তিতে বলছে তারই বা ভিত্তি কি? অতো প্রশ্ন তার মাথায় আসে না। অতো লজিক জানার দরকার তার মধ্যে অনুভূত হয় না। ফলে জ্ঞান কাঠামোয় নিজের সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে যাকে বলছে তার অবস্থানকে পরিমাপ করার ধৈর্যও সে ক্রমশ হারাচ্ছে। মনের আয়নায় দেখতে শেখানো বাঙালিত্ব মরে গেছে। হুজুগে বাঙালির সাংস্কৃতিক ধারা একুশ শতকের বিশ্বায়নের হাওয়ায় আবেগসর্বস্ব হয়ে উঠছে।

এতে হতাশার কিছু নেই। বাঙালির দৈনন্দিন রীতির বিশ্বায়ন তো বহু আগেই ঘটেছিল। কিন্তু সেদিনের বিশ্বায়ন, আজকেরটা নয়। এই মাত্রায় সেদিন গণ অংশগ্রহণও ছিল না। বিশ্বায়নের প্রাবল্য যত বৃদ্ধি পেয়েছে, অংশগ্রহণের মাত্রাও সেখানে সমানুপাতে বেড়েছে। সেদিনের গণ তার দেশীয় কিংবা আঞ্চলিক সংস্কৃতিতে ছিলেন স্পর্শকাতর। আজকের গণ শুধু উদাসীন সম্পর্কেই আবদ্ধ থাকে না, এই গণ হল 'গোলা পাবলিক'। ফলে বাঙালিয়ানার গর্ভগৃহে আজ বিশ্বায়ন হাজির। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, প্রযুক্তির বিকাশ, আভাসী পরিসরে বাঙালীর উপস্থিতি সেই পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। দেউলিয়া রাজনীতির রেণুতে নিষিক্ত হয়েছে স্পর্শকাতর বাঙালির বাঙালিয়ানা।

এই কথাও না মানার কোন কারণ দেখি না যে জীবন ও সংস্কৃতিতে প্রায় সব কিছুই পরিবর্তনশীল। স্থায়ী বলে যা কিছু থাকে সেটুকু একইভাবে এবং একই পরিচয়ে স্থায়ী থাকে না। সুতরাং এখনকার জীবন ও সংস্কৃতি আগামী শতকের জীবন ও সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন হতে বাধ্য। চলমান জীবনপ্রবাহের বৈশিষ্ট্যে একটা জাতির, একটা ভৌগোলিক অঞ্চল-সংস্কৃতির রূপান্তরের আখ্যান তৈরি হয়। এই রূপান্তরের ভেতর দিয়েই সংস্কৃতি এগোয়। মানব জীবনে সবচাইতে স্থায়ী যে বিষয়টি সংস্কৃতিতে প্রাথমিক উপাদান হিসেবে আছে তা হল তার ভাষা। সংস্কৃতির সেই তুলনামূলক স্থায়ী উপাদান ভাষাও পরিবর্তিত হয়। ধীরে। শতবর্ষ আগের বাংলা ভাষা এবং এখনকার ভাষা উচ্চারণ শৈলীতে এক হয় না। আবার পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষা চট্টগ্রামের বাংলা ভাষার মতো নয়। তবু শত পরিবর্তন সত্ত্বেও বাংলা ভাষা হল বাঙালিত্বের প্রাথমিক উপাদান। *একুশ শতকের* চেতন বাঙালি যখন *জীবনের* সর্বক্ষেত্রে নিজের ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তখন বুঝতে হবে কোথাও তার ভাষার বাঁধন দুর্বল হচ্ছে।

প্রাচুর্যের দূষণে আক্রান্ত হচ্ছে একুশ শতকের শিশুর ফুসফুস। সে বিষয়ে ভেবে দেখার সময় বাঙালির নেই। বিরুদ্ধতার ধারায় সে জিইয়ে রেখেছে তার আপাত হাতিয়ারের বল। সেখানে তার সঙ্গী আছে। সেটাই হল নিঃসঙ্গতার ভিড়। সেই ভিড়ে পুঁজির আড়ালে মিশে থাকা সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক মনে করায় কোন ভুল নেই। বাঙালি জানে প্রতিদিনের ব্যবহার্য দ্রব্যের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক বাজার দখলের ফলে জনজীবনে সবদিক থেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সমাজের নিচু তলার মানুষ। একদিকে তা যেমন অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা বাড়ায়, অন্যদিকে এর নিজস্ব দ্বেষের বিষে তা খুব ধীরগতিতে দেশপ্রেমের মিষ্টতায় আচ্ছন্ন করতে থাকে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে। ভাবুক বাঙালি সম্ভাব্যতায় মেনে নেয় যে সেটার ফল তার কাছে সুখময় নাও হতে পারে। তবুও সে তার আত্মমগ্নতায় সেটাকে প্রশ্রয় দেয়। পুলওয়ামার জঙ্গি হামলার ঘটনার পরবর্তী সময় পশ্চিমের বাঙালির দৈনন্দিন জীবন সেটার অল্প আঁচ পেয়েছে।

বাঙালির প্রতিবাদ আজ আপাত ভাবনায় আচ্ছন্ন। সে গভীরভাবে ভাবতে ভুল গেছে। সংগৃহীত জ্ঞান যে ঝাঁকাতে হয়, তাও আজ তার প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে না। ফলে বাঙালির শিরদাঁড়া খোঁজাখুঁজির দিন এসে গেছে। সে ভুলেছে দেশপ্রেম আর জাতীয়তাবাদের মধ্যে থাকা পার্থক্য। তার বাঙালিত্ব বোধে এখন আর বাংলাটা ঠিক আসে না। সকলের মধ্যে অবস্থান করার নির্মল আনন্দ সে সহজে পেতে চায় না। তাই গণমাধ্যম তার সংরক্ষণের দাবি তুলতে সাহস দেখায়। সংস্কৃতির প্রবাহে বাঙালি এখন সেই সামাজিক গণমাধ্যমের অংশীদার। বাঙালির গৃহকোণে বিশ্বের তাজা খবর আজ এক ক্লিকেই হাজির। এর জন্য সে লড়াই করেনি। বিশ্বায়ন তার ঘরে সেটাকে হাজির করেছে। সেই ব্যবহারে সে কোথাও আপাত ভাবনায় আচ্ছন্ন হচ্ছে। আর সেই আচ্ছন্নতায় বাঙালি সংস্কৃতি বিশ্বায়নের সমরূপতাকে প্রাধান্য দিয়ে ফেলছে। এখানেই একুশ শতকীয় বিশ্বায়নের সাংস্কৃতিক সাফল্য।

শেষের কথা

গ্রাম সমাজে বাঙালিত্বের গুরুত্ব কিছুটা থাকলেও মেট্রোপলিটন মনে এবং অভিবাসী জীবনে তা গুরুত্বহীন। সাবেকী পোশাকে বাঙালির এই অংশ সাবলীলও নয়। সে বিশ্বায়িত সমরূপতায় সামিল। স্থাপত্য ও অলঙ্কারের পার্থিব সাংস্কৃতিক উপাদানে তা প্রতিফলিত। এখানেই পুঁজির খেলা, বাজার দখলের লড়াই। অন্যদিকে অপার্থিব সাংস্কৃতিক উপাদানে ধরা যাক আমাদের লোকসংগীতের কথা। বাঙালির গভীর বিশ্বাস যে এটি তাদের সবচাইতে শক্তিশালী সংগীতমাধ্যম। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যে থেকে এটা উঠে আসে। লোকসংগীতকে ধারণ করে আজ

পপ সংগীত তৈরি হচ্ছে। রবীন্দ্রসংগীতকে রক-গানে পরিণত করার চেষ্টা চলছে। সংস্কৃতির এই প্রকার ভেদের একটা শ্রেণী চরিত্র আছে। সহজেই সেটা খুঁজে পাওয়া যায়। আপনিও তা খুব সহজে বুঝে যাবেন যদি দিন দুয়েকের জন্য একুশের 'লালু' হয়ে যান। মানে মরা পোড়াতে যারা আসছেন তাদের সঙ্গে মিশে যান। শ্মশানের সর্বত্র খোলা চোখে ঘুরে বেড়ান। আপনি বাঙালির শ্মশান সংস্কৃতির শ্রেণী চরিত্রে ডুব দিতে পারবেন। ভুললে চলে না, আমরা যা তাই হল আমাদের সংস্কৃতি।

এই পরিবর্তনে আমার বলার কিছু থাকতো না যদি তা বাঙালির নিজের চাহিদা হতো। এই অভ্যাস বাজার তৈরি করে, আমরা তাতে মত্ত হই। বানিয়ে ফেলা আদিম হল্লাকে সংগীত বলে যখন আমাদের গিলতে হয় তখন বলতেই হয়। বলতাম না, যদি না জানতাম পুঁজিবাদের পরজীবী চরিত্র, যেখানে নিজস্ব নিয়মে বেঁচে থাকতে কারুর শেকড় তাকে আঁকড়ে ধরতেই হয়, তা হলেও সমস্যা ছিল না। ফলে মানতেই হয় যে লগ্নি শক্তিশালী করতে চাওয়ার এটা একটা কার্যকরী মাধ্যম ও উপায়। এটিই উদারনৈতিক, "হাইপারবোলিক" বিশ্বায়নের অনিবার্যতা।

পুঁজিবাদের এই শেকড় চোষার পরিণাম ভয়ঙ্কর। একদিন তাকে বিচ্ছিন্ন করাও খুব কঠিন, আবার সেদিন নিজের আঁকড়ে থাকাটাও বাঙালির কাছে বেশ চাপের কাজ। মধ্যপ্রাচ্য থেকে আফ্রিকার জনজীবনে চোখ ফেরালে সেই আগ্রাসী সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন আমরা দেখতে পাই। এই সতর্ক বার্তা অনুধাবনে বাঙালি তার দাঁড়ানোর জায়গা চিনতে পারে। হৃদয়ের জোয়ারে সায় দিতে পারে।

তবুও বাঙালির দৈনন্দিন জীবনধারায় বিকল্প খোঁজার অভ্যাস মুছে যাচ্ছে। যে বাঙালি বিশ শতকে রেলগাড়ি চড়েছে, রেলবাজ হয়েছে, অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের খাদ্যাভ্যাসে ডিম ঢুকিয়েছে, সেই বাঙালি ইন্টারনেটে চড়ে মাঝে মাঝে কেমন মেরুদণ্ডহীন হয়ে যাচ্ছে। বিহারী, উর্দু, অসমীয়া ভাষার বিরুদ্ধে লড়াই করে যে বাঙালি নিজের ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করলো, সেই বাঙালি ইন্টারনেটে চড়ে ইংরাজি হরফে বাংলা লিখতে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধে আচ্ছন্ন থাকলো। বাঙালির হেঁসেল থেকে আজ উধাও হয়েছে ডিমভাজা আর মামলেট। সেই জায়গার দখল নিয়েছে এগ স্ক্র্যাম্বল আর স্টাফড অমলেট। এই অমলেট উইথ *ক্রিমি চিকেন* অ্যান্ড মাশরুম পাস্তার ছবি সামাজিক গণমাধ্যমের দেওয়ালে আজ বাঙালির স্টেটাস। সামাজিক মর্যাদার প্রতীক। আভাসী দুনিয়ায় ভেসে চলার শক্তি।

এই বহতা সমস্যার নয়। কিন্তু তা যদি সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির সমসত্ত্বতার, সমরূপতার পক্ষে দাঁড়িয়ে কাজ করে, সমস্যা তখন। সেটা যে ঘটছে না তা নয়। এই ঘটনা ঘটাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ সাহায্য করে। আত্মকেন্দ্রিকতায় সমাজে ব্যক্তিতাবাদ স্থায়ী হয়। পরিচিতি সত্তার ধারা-বৃদ্ধিতে ভূলুণ্ঠিত হয় বাঙালিত্বের যূথবদ্ধতা বৈশিষ্ট্য।

মানুষের আত্মস্বীকৃতির সীমানাও আজ ভূলুণ্ঠিত। ফলে নতুন খাতে বয়ে চলা। নতুন অভ্যাসের বাঙালিয়ানায় সে আজ ভেসে চলে এক ঘটনা থেকে আর এক ঘটনার ভাসমান তীরে। তার জীবনে একটা গল্প শেষ হতে না হতেই আর একটা গল্প আজ শুরু হয়ে যায়। আগেরটা ঠিক করে বোঝার আগেই তার সামনে উঠে আসে আর একটা নতুন ইস্যু। সে একটার পর একটা ইস্যুতে ভেসে চলে। বাঙালি মন সরে সরে যায় রূপ থেকে রূপান্তরে।

নোঙর ফেলতে জানে না এই বাঙালি। কিভাবে গভীরে হাতড়ে দেখতে হয় তা সে আগেই ভুলে গেছে। আগে পারতো, অনভ্যাসে আজ পারে না। নতুন করে শেখার কৌতূহল তার মনে জাগে না। বরং ভেসে চলাতেই সে বেশী

আনন্দ পায়। সে বোঝে পরিক্রমণীয়তাতেও একটা বিক্রম আছে। সেই অবোধের আনন্দে তার অন্য কিছুর জন্য ফুরসত নেই। তার অভিধানের পাতায় কিছু শব্দ জলে ধুয়ে গেছে, মুছে গেছে তিষ্ঠ ক্ষণকাল কথাটা। তাই অমর্ত্য সেনের নোবেল প্রাপ্তির খবরের বাঙালির পরিচয়ে সে যেমন লাফায়, তেমনি তাকে দেশদ্রোহী বলে খিস্তি করতেও তার একটুকু আটকায় না। পপ থেকে রক, ভাদু থেকে ভাংরা, ফুটবল থেকে ক্রিকেট, সবেতেই সে আছে। বাঙালিত্ব সচল থেকেছে বিশ্বাঞ্চলিকরণ প্রক্রিয়ায়। বাড়ির পাশেই আছে তার মদের কাউন্টার। আছে ডিজে সংস্কৃতি। আরও অনেক কিছু আছে যার মধ্যে দিয়েই তো বাঙালি এক অদৃশ্য অক্ষের চারিদিকে দৌড়ে চলেছে। স্থান-কালে মূর্ত হচ্ছে বাঙালির একুশ শতকীয় বিশ্বায়ন।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ:–

আনিসুজ্জামান। (২০১২)। *মুসলিম- মানস ও বাংলা সাহিত্য।* ঢাকা: চারুলিপি।

উমর, বদরুদ্দিন। (১৯৬০)। *সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা।* কলকাতা: প্যাপিরাস।

ঘোষ, প্রবোধ চন্দ্র। (১৯৪৯)। *বাঙালী।* কলিকাতা: সিটি কলেজ প্রকাশনী।

ঘোষ, বিনয়। (১৯৭৯)। *বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব ।* কলকাতা: সিগনেট।

চক্রবর্তী, সুধীর। (১৯৯০)। *বাংলা দেহতত্ত্বের গান।* কলিকাতা: প্রজ্ঞা।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার। (১৯৬২)। *সাংস্কৃতিকী।* কলিকাতা: বাক্-সাহিত্য।

চৌধুরী, সবিতা ও অন্যান্য (সংকলন ও সম্পাদনা)। (২০১৩)। *সলিল চৌধুরী রচনাসংগ্রহ: প্রথম খণ্ড, গান ।* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

জব্বার, আবদুল। (১৯৫০)। *বাংলার চালচিত্র।* কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ।

বসু, ত্রিপুরা। (২০০৯)। *দুশো বছরের বাংলা নথিপত্র।* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

বসু, মলয়। (১৯৭১)। *অক্টোবর-বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য।* ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস।

বিশী, প্রমথনাথ। (১৯৫৫)। *বঙ্গভঙ্গ।* কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ।

মজুমদার, মোহিতলাল। (১৯৪৫)। *বাংলার নবযুগ।* কলিকাতা: বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড।

মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর (সম্পাদিত)। (২০১১)। *নববর্ষ ও বাংলার লোক- সংস্কৃতি।* ঢাকা: সূচীপত্র।

মোসলে, লিওনার্ড। (১৯৬০)। *দ্য লাস্ট ডেজ অব ব্রিটিশ রাজ।* বোম্বে: জেইকো পাবলিশিং হাউস।

রহমান, মতিউর। (২০১৭)। *একুশের পটভূমি একুশের স্মৃতি।* ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

রায়, ধনঞ্জয়। (২০০০)। *তেভাগা আন্দোলন*। কলকাতা: কে পি বাগচি এন্ড কোম্পানি।

সেন, মনিকুন্তলা। (১৯৫২)। *সেদিনের কথা*। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন।

হোসেন, আয়ুব মহম্মদ। (১৯৮৭)। *বাংলার লোককথা*। কলিকাতা: পুস্তক বিপণি।

[**লেখক** – এম. এ, পি এইচ. ডি, সহকারী অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, প্রফেসর নুরুল হাসান কলেজ, ফারাক্কা, মুর্শিদাবাদ]

[পত্রিকার গত ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ওয়েব এডিশনে "বাঙালি জীবন ও আজকের বিশ্বায়ন" শীর্ষক শিরোনামে লেখার প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয়েছিল। এটা দ্বিতীয় কিস্তি।]